সংবাদ

তারিখ ... 31 MAY 2010 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিও নিয়ে এমপিদের দৌড়ঝাঁপ

আকমল হোসেন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এটা সবার সাংবিধানিক অধিকার। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ধারায় এটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষার দর্শন ও লক্ষ্য বিষয়ে সংবিধানের ১৭ ধারায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিরোনামে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান, সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক গড়ার কাজ করবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়োজিতরা সংবিধানের আলোকে তা বাস্তবায়ন করবেন- এটাই সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, শাসক মহল সেই কাজটি আন্তরিকতার সঙ্গে করেনি। এখনও করছে না। রাজনৈতিক কমিটমেন্টের অভাব আর জনতার সচেতনতার অভাবের সুযোগে সংবিধানের আলোকে জনগণের সর্বজনীন গণমুখী শিক্ষা আজও নিশ্চিত হয়নি। বরং সংবিধানকে উপেক্ষা করে তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এই শিক্ষা কার্যক্রম চলছে তিনটি সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে- সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা, আধাসরকারি বিশেষ করে এমপিও এর ভিত্তিতে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ৮০ ভাগ শিক্ষাই পরিচালিত হচ্ছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ৪ লাখ ৬৭টি হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর মাধ্যমে এটা চলছে। তাদের জাতীয় বেতন স্কেলের ১টি অংশের শতকরা ১০০ ভাগ প্রদান করলেও আরেকটি অংশ বিশেষ করে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা, অধ্যক্ষ থেকে পিয়ন সবার জন্যই মাসিক যথাক্রমে ১০০ টাকা এবং ১৫০ টাকা প্রদান করা হয়। সবারই চাকরিজীবনে একটি মাত্র বর্ধিত বেতনের সুযোগ রয়েছে। পুরনো এমপিওর বাইরে শিক্ষা বিস্তারে সরকার প্রায় ১০ হাজারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সময়ে পাঠদানের জন্য একাডেমিক স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন বেতন-ভাতা দেয় না দীর্ঘ ১০ বছর ধরে। গত ৬ বছর এমপিও প্রদান কাজটাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্থানীয় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী সমাজপতি ও রাজনীতিকদের সহায়তায় গড়ে উঠেছিল এসব প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা কোন বেতন-ভাতা না পেলেও চাকরি নিতে তাদের পকেট থেকে ব্যয় হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকাকড়ি আর এর বেনিফিসারি হয়েছেন ওইসব প্রভাবশালী সমাজপতি ও রাজনীতিক। ক্ষমতার হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনীতিকের আত্মীয়-পরিজনের নামে গড়ে তোলা হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্র [illegible]নের নামকরণ করতে বোর্ড ও জাতীয় [illegible]বিদ্যালয় নির্ধারিত অঙ্কের টাকা দিলে [illegible]ষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন [illegible]র কথা আসলে সেটা হয়নি। বরং এখা[illegible]যে হারে বিনিয়োগ করেছে তার চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ বাণিজ্য করেছেন প্রভাবশালী ওইসব মহল। বৈষয়িক এহেন লেনদেনের কারণে প্রভাবশালী ওইসব মহল ও রাজনীতিকরা ওই প্রতিষ্ঠানের এমপিও করে দেয়ার দায়ে বদ্ধ ছিলেন। তাই তো ৬ বছর পর এমপিও ছাড়ার ঘোষণায় এমপি-মন্ত্রীরা দৌড়ঝাঁপ শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের হিসাব মোতাবেক এবং প্রণীত এমপিও নীতিমালার আলোকে সাড়ে ৭ হাজার প্রতিষ্ঠান এমপিও পাওয়ার যোগ্য, তবে সরকারের আর্থিক সঙ্কটের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে ১১২ কোটি টাকার বরাদ্দ দ্বারা ১ হাজার ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও করবে, তারই আলোকে ও যে ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও করার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিও করলে মোট অর্থের প্রয়োজন ছিল ৬৫০ কোটি টাকার। এর মাধ্যমে দেশের ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। এমপিওসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছিল প্রায় ৭ মাস আগে। প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা ওই কমিটির প্রধান ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক একজন শিক্ষক এবং আওয়ামী লীগের আগের টার্মের সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য। ১৫ দিনে নীতিমালা চূড়ান্ত করার নির্দেশনা থাকলেও তিনি তা জমা দিয়েছেন ৭ মাস পরে। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের দায়িত্ব জ্ঞান যদি এই হয় তবে জাতি কাদের ওপর নির্ভর করবে আর ডিজিটাল বাংলাদেশই কীভাবে হবে- এমন প্রশ্ন এসে যায়। ওই কমিটি প্রণীত নীতিমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, ওইসব প্রতিষ্ঠানই এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবে, যাদের একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ বেশি, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও পাসের সংখ্যা বেশি।

সেই আলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ হাজার ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণীত হয়েছিল বলে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষ্য। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর সরকারদলীয় এমপি, মন্ত্রী, যুবলীগ নেতা ও আওয়ামী লীগ নেতা এমপিওসংক্রান্ত নানা অভিযোগ করতে থাকেন। দেশের বিভিন্নাঞ্চলে অবরোধ, হরতাল এবং শিক্ষামন্ত্রীকে দোষারোপ করতে থাকে। এমপিও নীতিমালা, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা আর সরকারি দলের এমপি এবং মন্ত্রীদের ডিও লেটারের ভিত্তিতেই ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানের এমপিও হয়েছে এমন যুক্তি দাঁড় করানোর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী আক্রমণ থেকে রক্ষা পান ঠিকই, তবে এমপিওসংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে তিনি সরে আসেন। সরকার সমর্থিত এমপি এবং মন্ত্রীরা এমপিওসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের যে অভিযোগ করেছেন সেটা শিক্ষামন্ত্রী চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন এবং তিনি সেটাতে সফলও হবেন বলে তার কার্যক্রমে আশা করা যায়।

একটি এলাকার একজন এমপি এসএসসি পাস করেননি। তিনি ডিগ্রি পর্যায়ের চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন তার আত্মীয়স্বজনকে। নিয়োগ এবং এমপিও সংক্রান্ত ডিও লেটারের বড় বড় বাণিজ্যের অভিযোগ তার সম্পর্কে উঠেছে। চারদলীয় জোটের নেতাদের আত্মীয়-পরিজনের নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও হওয়ায় সরকারদলীয় এমপিদের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য ডিও লেটার তো মন্ত্রী এবং সরকারিদলীয় এমপিরাই দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সরকার সমর্থিত লোকদের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারবিরোধী সমর্থকদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার সমর্থিত এমপিরা গুরুত্বের সঙ্গে ডিও লেটার দিয়েছেন। কারণ এখানেও ওই বৈষয়িক বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে

কিন্তু অভিযোগকারী ওই অভিযোগ থেকে রেহাই পাবেন কি না সেটা ভাবার বিষয়।

দীর্ঘ ১০ বছর একটি শিক্ষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের কারণে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু অবগত হয়েছি তাতে রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। একটি এলাকার একজন এমপি এসএসসি পাস করেননি। তিনি ডিগ্রি পর্যায়ের চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন তার আত্মীয়স্বজনকে। নিয়োগ এবং এমপিওসংক্রান্ত ডিও লেটারের বড় বড় বাণিজ্যের অভিযোগ তার সম্পর্কে উঠেছে। চারদলীয় জোটের নেতাদের আত্মীয়-পরিজনের নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও হওয়ায় সরকারদলীয় এমপিদের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য ডিও লেটার তো মন্ত্রী এবং সরকারিদলীয় এমপিরাই দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সরকার সমর্থিত লোকদের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারবিরোধী সমর্থকদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার সমর্থিত এমপিরা গুরুত্বের সঙ্গে ডিও লেটার দিয়েছেন কারণ এখানেও ওই বৈষয়িক বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এমপি ও মন্ত্রীরা যে হারে ডিও লেটার দিয়েছেন সেই হারে প্রতিষ্ঠান এমপিও হয়নি। ফলে স্থানীয় এমপিদের ওপর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চাপ ছিল বেশি। যে চাপের কারণে এমপি, মন্ত্রীরা নতুন এমপিওর জন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় এমপিওভুক্তি হলে সেটা হবে বড় আত্মঘাতী। কারণ বর্তমান শাসক, বিগত শাসকের সম্পর্কে যে অভিযোগ করছে, তারাও সেই অভিযোগ থেকে রেহাই পাবে না। এই সমস্যা সমাধানে সরকারের একটাই সফল উদ্যোগ হতে পারে, আর সেটা হলো সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা অথবা সরকার থেকে প্রণীত এমপিও নীতিমালা অনুসরণ করা। মুখ চিনে এমপিও করার কোন সুযোগ নেই। দলীয়করণের বলির পাঁঠায় ন্যায় যেন আর কেউ বলি না হয় গণতান্ত্রিক সমাজে এটা সবাই আশা করে।

শিক্ষা এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক বিনিয়োগ। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। এটা বাস্তবায়ন করতে সাড়ে ৭ হাজার প্রতিষ্ঠানের অর্ধলাখ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করতে সরকারি হিসাব মোতাবেকই প্রয়োজন ৬৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার ১১২ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়ে ১৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওর ব্যবস্থা করেছে। বাকি টাকার ব্যবস্থা করলে এমপিওসংক্রান্ত সব সমস্যা চুকে যাবে, ফলে বাঁচবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। সম্মান রক্ষিত হবে বৈষয়িক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ডিও দানকারী এমপিদের। এই টাকারও যে খুব একটা সমস্যা এমন নয়, বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে অনেক টাকার মিসইউজ হচ্ছে, বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তনের কারণে ১২০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, এমপি, মন্ত্রীদের বেতন-ভাতা আর গাড়ির তেলসহ বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হচ্ছে তার একটা অংশ সাশ্রয় করলেই এমপিওসংক্রান্ত সমস্যা সমাধান সম্ভব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে একবারে ৩৬ হাজার ১০০টি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ করেছিলেন, আর তার সৈনিকরা এটা করতে ভয় পায় কেন? ওই কাজের চেয়ে এ কাজটা তো তেমন কঠিন নয়। কঠিন শুধু আন্তরিক হওয়া, কঠিন শুধু দলীয় সঙ্কীর্ণতামুক্ত হওয়া। অনেক এমপিরই সামর্থ্য আছে তারপরও গাড়ি ও তেল খরচ বাবদ মাসিক ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ, এটা কি মানবিকতার কারণে ত্যাগ করা যায় না? অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির একদিনের মদের খরচ একজন গার্মেন্ট শ্রমিকের ১ মাসের বেতন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ হওয়া দরকার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল এবং মহাজোটের কাছে এ বিষয়ে সবারই প্রত্যাশা- আর এর জন্য দরকার গভর্নিংবডি দলীয়মুক্ত করা, নিয়োগ কার্যক্রম থেকে গভর্নিংবডিকে প্রত্যাহার করা, এমপিওর জন্য এমপি, মন্ত্রীদের ডিও লেটার প্রদানের নিয়ম বন্ধ করা।

[লেখক : কলেজ শিক্ষক]